ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ এবং একজন লাদেন

ম্যানহাটনের রাস্তার ধারে বসে কফি খাচ্ছেন এক লোক। হঠাৎ বিমানের শব্দ পেয়ে উপরে তাকালেন। দেখলেন একটি বিমান পুরো বেগে ক্র্যাশ করলো রাস্তার অপর পাশে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে। তার কাছে সে মুহূর্তে হয়ত মনে হয়েছে অভাবনীয় এক দুর্ঘটনা দেখলেন তিনি। অথচ তা ছিল না দুর্ঘটনা। ছিল পরিকল্পিত ঘটনা ... লিখেছেন

জায়েদ আলমের খান

১৯৯৪ সালের জুলাই মাস। অন্য অনেকের মতো তিনিও পা রাখলেন আমেরিকার মাটিতে। সারা পৃথিবী থেকে মানুষ যেভাবে আমেরিকায় আসে, সেভাবে। তবে অন্যদের সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে। তার নাম আবদুর রহমান আল ওমারী। ফ্লোরিডার উপকূলীয় শহর ভোরো বিচ সমুদ্র সৈকতে বাসা ভাড়া করেন তিনি মাসে ১,৪০০ ডলারে। কাছেই ছিল ফ্লাইট সেফটি একাডেমী নামের একটি বিমান প্রশিক্ষণ স্কুল। ভর্তি হলেন সেখানে। প্রতিদিন ভোরবেলা বেরিয়ে যেতেন আল-ওমারী, তার চার সন্তানকে স্কুলে নামিয়ে নিজে যেতেন ফ্লাইট স্কুলে। তার স্ত্রী বাগান করতেন, শপিং মল-এ যেতেন, প্রতিবেশীদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতেন। স্বাভাবিক এক আমেরিকান জীবন যাপন।

এখান থেকে ১০০ মাইল দূরে কোরাল স্প্রিংস-এ থাকতেন মহম্মদ আমানুল্লাহ আতা। ৩৩ বছর বয়সী এই ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারও আমেরিকায় পাড়ি জমান বছরখানেক আগে। তিনি আসেন জার্মানি থেকে, সঙ্গে অনুজ-তুল্য মারওয়ান ইউসেফ আল-শেহরিকে নিয়ে। এরা দু'জনও এডভান্সড লেভেল ফ্লাইং শিখছিলেন। ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিলেন তারা।

আতা, আল-ওমারী, আল শেহরীর মত আরও অনেকে ছিলেন। সব মিলে ডজনখানেকের বেশি আরব যুবক বিমান

১৩০০ ফুট লম্বা দালান এক ঘন্টার মধ্যে পরিণত হলো ধ্বংস্তূপে

চালনার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন আমেরিকার পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন শহরে। সবাই শিখছিলেন বড় জেট প্লেন চালানো। এরা ছাড়া সারা আমেরিকা জুড়ে আরও ত্রিশ-চল্লিশ জন পালন করছিলেন তাদের ছোটখাটো দায়িত্ব। তাদের কেউ অনেক বছর ধরে আমেরিকায় বসবাসরত। অন্তত দুইজনের ১৯৯৪ সাল থেকে মার্কিন ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল। অন্তত একজনের বিমানবন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় ঢোকার এক্রেডিটেশন কার্ড ছিল। কারও ছিল বাণিজ্যিক ভিসা, কারও ভুয়া পাসপোর্ট। বেশির ভাগই থাকতেন ফ্লোরিডার উচ্চ-ভিলাষী রেসর্ট শহরগুলোতে। এদের বয়স বিশ থেকে একান্ন। আর এদের নেতা ছিল কোরাল স্প্রিংসের আতা। এদের সবারই উদ্দেশ্য ছিল এক এবং অভিন্ন।

গত মাসে আতা হঠাৎই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাকে দেখা যায় বিভিন্ন রেন্ট-এ-কার ভাড়া নিতে। প্রতিটি গাড়িই ফেরত এসেছে প্রচুর মাইলেজ জমিয়ে। ১৫ আগস্টে ভাড়া নেয়া একটি শেভরলে গাড়ি তিনি চালান ১,৯১৫ মাইল। তার বিমান চলনার মাইলেজও বাড়তে থাকে। গত বছর নবেম্বর মাসে জার্মানিতে হামবুর্গ থেকে পৌঁছানোর পাঁচ মাসের মধ্যেই তিনি ফেডেরাল এভিয়েশন অথরিটির (এফ.এ.এ) কোর্স পাস করেন। কোর্সের খরচ ছিল দশ হাজার ডলার। গত মাসে হঠাৎই তিনি উঠে পড়ে লেগে যান তার ফ্লাইং স্কিল্‌স আরও সূক্ষ্ম করতে। বাণিজ্যিক পাইলট হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ১০০ ঘণ্টা লগ করার দরকার দেখিয়ে প্রায়ই ফ্লাইং ক্লাবের প্লেন নিয়ে চালাতেন একাই।

অন্যত্রও বাড়তে থাকে অ্যাকটিভিটি। ৫ সেপ্টেম্বর সাদা রঙের একটা মিতসুবিশি গাড়ি দেখা যায় বস্টনের লোগান এয়ারপোর্টে। গাড়ির চালকের সিকিউরিটি পাস ছিল। সংরক্ষিত এলাকায় ধরা পড়লে পাস দেখিয়ে জটিলতা এড়ান। পরের চার দিনের প্রতিদিনই গাড়িটি দেখা যায় এয়াপোর্ট কমপ্লেক্সে। একই রকমের সময়ে ভেরো বিচের আল-ওমারীর সেই স্বাভাবিক আমেরিকান পরিবার ছেড়ে দেয় তাদের পরিপাটি আমেরিকান বাসা। আল-ওমারী হঠাৎ উধাও হয়ে যান। আমেরিকা জুড়ে আতার লোকজন ছাড়তে থাকেন তাদের বাড়ি, ফ্ল্যাট, গেস্ট হাউস।

তাদের মাঝে ১৮ জনের মত বস্টনের পথ ধরেন। কানাডা থেকে আসেন ক'জন নির্জন মেইন স্টেটের ছোট ছোট বর্ডার পয়েন্ট দিয়ে। আতা ও আল-ওমারী ওঠেন মেইনের নিরিবিলি শহর সাউথ পোর্টল্যান্ডের কমফোর্ট ইন-এ। ৪৩২ নম্বর রুমে। আরও দু'জন ওঠেন বস্টনের পার্শ্ববর্তী নিউটনের পার্ক ইন-এ। আতা হোটেল ছাড়েন মঙ্গলবার ভোরে। হোটেল কক্ষে ফেলে যান বাণিজ্যিক বিমানের সময়সূচি। সময়সূচি ঘাটবার, দেখার মতো সময় তার ছিল না। এতদিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষ প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত তিনি। তখন সময় শুধু পৃথিবী বদলে দেয়ার। তাদের বদলে দেয়ার পরিকল্পনা দেখে পৃথিবী হয়ে গেল স্তম্ভিত। সারা পৃথিবী দেখলো এক ভয়াবহ পরিকল্পনার অকল্পনীয় বাস্তবায়ন।

মঙ্গলবার সেপ্টেম্বর ১১। ভোর ৫.৫৩ মিনিটে আতা ও আল-ওমারী মেইনের পোর্টল্যান্ড জেটপোর্টের নিরাপত্তা চেক সম্পন্ন করে বিমানে ওঠেন। তাদের ফ্লাইট বস্টনের লোগান বিমানবন্দরমুখী। আতার ভিসা কার্ডে কিনেছিলেন দুটো ওয়ান ওয়ে টিকিট। বস্টনে নেমে তারা চেক-ইন করেন লস্ এঞ্জেলেস্‌গামী আমেরিকান এয়ারলাইনস ফ্লাইট ১১তে।

একই রকম সময়ে সেই ফ্লাইটের ক্যাপ্টেন জন ওগনস্কি পৌঁছান লোগানে। এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে কফি খেতে বসেন। কিছুক্ষণ পর পাশে এসে বসেন কো-পাইলট টম ম্যাকগিনেস। তিনি বিমান বাহিনীর এফ-১৪ টমক্যাট পাইলট ছিলেন। কফি বারের বেয়ারার সঙ্গে কুশল বিনিময় করে বললেন, কি পরিষ্কার আকাশ আজ, খুব স্মুদ ফ্লাইট হবে নিশ্চয়ই।

সকাল ৭.১৫ মিনিটে সেই সাদা মিতসুবিশি গাড়ি করে এয়ারপোর্টে এলো তিন আরব যুবক। পার্কিং লটে ছোটখাটো ঝগড়া হল পাশের গাড়ির সঙ্গে, পার্কিং স্পেস নিয়ে। তারপর সোজা টার্মিনালে চেক-ইন। শোয়া ঘণ্টার মধ্যে অন্তত পাঁচজন আরব

ছবিতে পাখির মতো ছোট্ট প্রাণী তিনটি মানুষ। ওরা বাঁচতে চেয়েছিল। তাই ৯০ তলা থেকে পর্যন্ত মানুষ ঝাঁপ দিয়েছে আগুনের ভয়ে

যুবক পার হলেন নিরাপত্তা চেক পয়েন্ট। তাদের হ্যান্ড লাগেজে লুকিয়ে রাখা বক্স-কাটার ছুরিগুলো ধরা পড়লো না স্ক্যানিং মেশিন-এ।

৭.৩৫-এর মধ্যে ফ্লাইট ১১-এর ৮১ জন যাত্রীর প্রায় সবাই উঠে গেলেন বোয়িং ৭৬৭ বিমানে। বেশ বড় এই বিমানে প্রায় আড়াই শ' যাত্রী ধরে। আতা বিজনেস ক্লাসের সিট ৮ডিতে বসেছিলেন। তার পাশে হলিউড প্রযোজক ডেভিড অ্যানফেল ও তার স্ত্রী। আল-ওমারীর সিট ৮জি-তে। তার পেছনের সিটে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কমিউনিকেশন শিল্পপতি এডমুন্ড গ্লেসার। তাড়াহুড়া করে বাড়ি ছাড়া গ্লেসার প্লেনে উঠেই মোবাইল থেকে ফোন করলেন তার স্ত্রীকে —আমি সময় মতই পৌঁছেছি এয়ারপোর্টে।

ফ্লাইট ১১-এর সামনে রানওয়ের টেক-অফ কিউতে অপেক্ষমাণ ছিল লস এঞ্জেল্সগামী আরেকটি বোয়িং ৭৬৭। ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১৭৫। সেই প্লেনে ৬৫ জন যাত্রী। যার মধ্যে আতার শিষ্য মারওয়ান ও তার ভাই মোহাম্মদ আল-শেহরী ছিলেন। আরও ছিলেন ফয়েজ আহমেদ এবং আরেক ভাতৃদ্বয় হামজা ও আহমেদ আল-গামদী। তাদের ফ্লাইট উড্ডয়ন করে সকাল ৭.৫৮ মিনিটে। ঠিক এক মিনিট পর মাটি ছেড়ে যায় ফ্লাইট ১১।

সকাল ৮.০১ মিনিটে ১৫০ মাইল দক্ষিণে নিউইয়র্কের নুয়ার্ক বিমানবন্দর ছাড়ে সানফ্রান্সিসকোগামী ইউনাইটেড ফ্লাইট ৯৩। সেই ফ্লাইটে ছিল ৪৫ জন যাত্রী। নয় মিনিট পর আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ৭৭ লস্ এঞ্জেলসের পথ নেয় ওয়াশিংটনের ডালেস বিমানবন্দর থেকে। এই ফ্লাইটের ৬৪ জন যাত্রীর মধ্যে ছিলেন নামকরা সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার বারবারা ওলসন। আরও ছিলেন সান্টা ক্রুজ দ্বীপে শিক্ষা সফরের পথে একদল প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী।

চারটি প্লেন। সব মিলিয়ে ২৭২ জন যাত্রী ও মহাদেশ পাড়ি দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় হাজার হাজার টন জ্বালানি। এবং প্রতিটিতে একদল আরব যুবক। মহাদেশ পাড়ি দেয়া বা ভ্রমণ যাদের উদ্দেশ্য নয়।

বিমান ছাড়ার ঠিক ১৪ মিনিট পর উঠে দাঁড়ালেন কয়েক জন আরব যুবক। আতা এবং তার সহযোগীরা যখন সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তখন ঘড়িতে ৮.১৫ মি.। এগিয়ে গেলেন ককপিটের দিকে। ককপিটের লক খুলে ক্যাপ্টেন ওগনস্কি বেরিয়ে এলেন। কিন্তু এভাবে তার বেরিয়ে আসার কথা নয়। অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হয়ত আতা এবং তার সহযোগীদের কর্মকান্ডের কারণেই লক খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। ধারণা করা হয় ছুরি দেখিয়ে হুমকি বা জখম করা হয়েছিল এয়ার হোস্টেস বা যাত্রীদের কাউকে। বিষয়টি বোঝার জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন ওগনস্কি। আসলে এটা একটা ধারণা মাত্র। ঐ সময়ে ঠিক কী ঘটেছিল, সেটা কোনো দিনই জানা যাবে না। কারণ প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউই জীবীত নেই। নেই কোনো রকম সাক্ষী প্রমাণ। দুই পাইলটের একজন ক্ষণিকের জন্য মাইক্রোফোন অন করলে এয়ারপোর্টের ফ্লাইট কন্ট্রোলাররা শুনতে পান, 'আমাদের হাতে আরও প্লেন আছে। বোকামি কর না। তবে আঘাত পাবে না' ('উই হ্যাভ প্লেনস ডোন্ট ডু এনিথিং ফুলিশ... ইউ উইল নট বি হার্ট')। তবে হুমকি দেয়ার প্রমাণ দেয় এই বাক্য। হাইজ্যাক হয়ে গেল আমেরিকান এয়ার লাইন্সের একটি বিমান। আতা এবং তার সহযোগীরা হাইজ্যাক করলেন এই বিমান। হাইজ্যাকিং-এর সিগন্যাল একটা গোপন চার-ডিজিট কোড কখনই পাঠানো হয়নি। এটাও এক রহস্য। এরপর একবারই কন্ট্রোলাররা সাড়া পান

ফ্লাইট ১১-এর। যখন নিউইয়র্কের পথে এয়ার করিডর চাওয়া হয়। তারপর বিমানের ট্রান্সপন্ডার, যার মাধ্যমে এয়ারপোর্ট থেকে বিমানের গতিবিধি ট্র্যাকিং করা হয়, তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

৮.৪৫ মিনিটে আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১১ তার স্বাভাবিক গতিপথের উল্টো দিকে ঘুরে ঘণ্টায় চারশ' মাইল বেগে নিশানা করে ম্যানহাটন।

ততক্ষণে দ্বিতীয় হাইজ্যাকিংও চলছে। সকাল ৯টার দিকে ইউনাইটেড ফ্লাইট ১৭৫-এর যাত্রী পিটার হ্যানসন তার বাবা-মাকে ফোন করে বলেছেন যে ছুরি নিয়ে কিছু লোক বিমানটি হাইজ্যাক করেছে। নিউইয়র্কের পশ্চিমে নিউজার্সির ওপর থাকাকালীন প্লেনটি হঠাৎ ঘুরে মোড় নেয় ম্যানহাটনের দিকে। ৮.৫৯ মিনিটে, এখন ম্যানহাটনের দক্ষিণে, প্লেনটি আবার ঘুরে উত্তরমুখী হয়। হ্যানসন আবারো ফোন করেন বাসায়। বলেন যে প্লেনটি খুব দ্রুত নেমে পড়ছে। একই সময় একজন কর্মরত বিমান পরিচারিকা প্লেনের পেছন থেকে ফোন করেন ইমার্জেন্সি নাম্বারে। বর্ণনা দিচ্ছিলেন অপর পরিচারিকার ছুরিকাঘাতের। হঠাৎ বলে ওঠেন, আমি স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখতে পারছি। অসম্ভব নিচ দিয়ে যাচ্ছে আমাদের বিমান।

সকাল ৯টার দিকে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা প্রথম বুঝতে পারেন ওয়াশিংটন থেকে ছাড়া ফ্লাইট ৭৭-এর হাইজ্যাকিং-এর। ককপিটের ট্রান্সপন্ডার অফ করে দেয়ায় হঠাৎ রাডার স্ক্রিন থেকে উধাও হয়ে যায় প্লেনটি। কিছুক্ষণ পর তারা সিগনাল পায় অশনাক্ত একটি বিমানের। ঘণ্টায় ৫০০ মাইল বেগে উল্টো ওয়াশিংটনের দিকেই ছুটে যাচ্ছে।

সাড়ে ৯টার সময় সেই প্লেনের হাইজ্যাকারদের নেতা খালিদ আল-মিধার যাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা বাড়িতে ফোন কর, বল যে তোমরা এখনই মৃত্যুবরণ করবে। বারবারা ওলসন তার স্বামীকে ফোন করেন। তার স্বামী সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেন এফবিআই কম্যান্ড সেন্টারে। তারা বলে তাদের কাছে কোনো হাইজ্যাকিং-এর খবর নেই।

৯.৪২ মিনিটে প্লেনটিকে ওয়াশিংটনের আকাশে দেখা যায়। শহরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান কালে। হঠাৎ ২৭০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে নিশানা নেয় মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর পেন্টাগনের। পরবর্তী মিনিটের মধ্যেই নোজডাইভ দিয়ে আঘাত হানে তার টার্গেটে। তৎক্ষণাৎ ধসে পড়ে পাঁচতলা ভবনের একাংশ। মারা যায় ৬৪ যাত্রীসহ ১৯০ জন। তখন বাজে ৯.৪৩ মিনিট। বিমানটি রোধ করতে ডাকা হয়েছিল মার্কিন বিমান বাহিনীর ফাইটার প্লেন। তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পনেরো মিনিট পরে।

এই সন্ত্রাস আর জিহাদ এক নয়

জিয়াউদ্দিন সরদার

কেমন মানুষ এই প্রচণ্ড ধ্বংস চালাতে পারে? টেলিভিশনের পর্দায় যে ক'বার এই ছবি দেখেছি, প্রতিবারই নিজেকে প্রশ্ন করি। প্রতিবার আমি খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ি। এই কুকীর্তির নায়ক যারা, তারা নিজেদের মুসলমান দাবি করে? তারা একই কুরআন থেকে শিক্ষা নেয়? তারা ঐ একই নবী মুহম্মদের অনুসারী?

একজন মুসলমান লেখক হিসেবে আমার উত্তরগুলোর জানার কথা। লোকজন আমার কাছে সন্ত্রাসীদের মতাদর্শ ও বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের ধর্মীয় ব্যাখ্যাটি জানতে চায়। আমার প্রতিবেশী জানতে চায়, কোন ধরনের মুসলমান এমন কাজ করে। তাদের ধারণা, আমি একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেবো। কেমন করে, কিসের বিশ্বাস থেকে একজন কিভাবে আত্ম-ধ্বংসী বোমাবাজ হয়, কিভাবে খুনি হয় তার চিন্তাধারা আমাকে ব্যাখ্যা করতে বলে।

আমি তাদেরকে কুরআনের কথা বলি, 'আমাকে হত্যার জন্যে তোমার হাত বাড়ালেও, তোমাকে হত্যার জন্যে আমি আমার হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্ববিধাতা আল্লাহকে ভয় করি'। আমি পয়গম্বর মুহম্মদের কথা উচ্চারণ করি, 'একজন নিরীহ মানুষের হত্যা, সমগ্র মানবতা হত্যা শামিল'। তাদেরকে বলি মুহম্মদ সাধারণ জনগণ, নারী ও শিশু, বৃদ্ধি ও অথর্ব হত্যা বাড়িঘর, ফসল ধ্বংস ও পশু হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন। এমনকি পুরোদস্তুর যুদ্ধের মাঝেও। তারা আমাকে শহীদ হিসেবে আত্মত্যাগের কথা জিজ্ঞেস করে। 'এই ছিনতাইকারীরা তাদের প্রাণের বিনিময়ে বেহেস্তে যাওয়া নিশ্চিত করছে না'? আমি বলি ইসলামী দর্শনের কথা। এখানে কোনো ব্যবসায়িক লেনদেনের স্থান নেই। কেউই জানে না পরকালে তার কোথায় ঠাঁই মিলবে। শুধু বিধাতা জানেন। নবী মুহম্মদও ভয়ে কেঁদেছিলেন তিনি ক্ষমা পাবেন কিনা সেই ভয়ে। আত্মদানের ইসলামী মতাদর্শের উদাহরণ স্থাপন করে নবী মুহম্মদের নাতি ইমাম হোসেন। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কারবালার প্রান্তরে তিনি ৭০ জন অনুসারী নিয়ে ৪০০০ জনের বাহিনীর মোকাবেলা করতে রুখে দাঁড়ান। উদ্দেশ্য ছিল একটিই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে তুলে ধরতে। নিজের জীবন দিতে হবে নিশ্চিত জেনেও তিনি যুদ্ধ করে যান। তার আত্মত্যাগ স্ব-আরোপিত নয়। নীতিগতভাবে সঠিক পথে অনড় থাকার ফল। আত্ম-ধ্বংসী ছিনতাইকারীরা সৃষ্টিকর্তার সমস্ত সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করছে, তারা শহীদ কথাটিকে সস্তা বানিয়ে ফেলছে।

অনন্যোপায় হয়ে সহায়, সম্পত্তি, ভোগ-বিলাস ও জীবন ন্যায়ের জন্যে ত্যাগ করলে তাকে শহীদ বলে। সেতো যেকোনো ধর্মাবলম্বীর জন্যেই প্রযোজ্য। কিন্তু ধর্ম আমাদের মানবতাবোধও শেখায়, শেখায় যে পরম করুণাময়ের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী আমাদের অন্তিম বিচার হবে। শাহাদাত বরণ জীবন ধারণের মতই বিধাতার ইচ্ছাধীন। প্রকৃত ঈমানদারই বেহেস্তের পথে হাঁটার আশা রাখতে পারেন।

ইসলামী বেহেস্ত আবার হুরীতে ভরা হারেমখানাও নয়। মওজ-মাস্তীর আখড়াতো নয়ই, কুরআনের বেহেস্ত একটি পূর্ণ নিষ্পাপতার স্থান। হুরীরা তাদের নাম পেয়েছে গেজেল হরিণের চোখ থেকে। তারা সৌন্দর্য ও সিম্পাপতার প্রতীক, কখনো সেই চোখে তারা পাপ দেখেনি। বেহেস্তের গুলশানে তারা 'শান্তি, শান্তি' উচ্চারণ করে থাকে। পৃথিবীর বুকে বিধাতার রাজ্য তৈরি করাই ইসলামের মূল বক্তব্য। এটাই জিহাদ। এখন এটা একটি শব্দ মাত্র। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'সত্য' পৃথিবীর শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটি চিন্তা স্রোত বেয়ে নামে। এই বেহেস্ত সন্ধানী সন্ত্রাসীরা নিশ্চয়ই আমেরিকার ওপর জিহাদ ঘোষণা করেছে? সন্ত্রাস আর জিহাদ এক নয়। তারা বিধাতার একান্ত আদেশ অমান্য করে। সত্যিকারের জিহাদ অন্তরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, অন্তরের যে ধারণা সন্ত্রাস ঘিরে থাকে কিংবা যা জীবনের মূল্যবিবর্জিত তাকে রোখাই জিহাদ। সব মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করাটাই প্রকৃত জিহাদ।

কিন্তু আত্ম-বিধ্বংসী মুসলমানদের ধারণা মতাদর্শ যেন এরই বিপরীত প্রতিফলন। 'আমরা সুষ্ঠু জীবন কাটাই পরকালে বেহেস্তের আশায়। আমরা ন্যায়ের পথ নেই, বিধাতার সামনে মাথা নত করি কিন্তু তার দেয়া আশ্বাসকে নিশ্চয়তা হিসেবে গ্রহণ করি না'। এটি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট বুক অব মিকা থেকে বলছি। কথাগুলো কিন্তু মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি সবার জন্যে প্রযোজ্য।

ইসলাম এই ছিনতাইকারীদের কর্মকাণ্ডের কোনো নৈতিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না, যেমন খ্রিস্টান পারে না গ্যাস চেম্বারের ব্যাখ্যা দিতে, কিংবা ক্যাথলিক ধর্ম ওমানের সেই বোমা হামলা। এটি ছিল এমন কয়েকজনের কাজ যারা পথছাড়া, ধর্মের পথছাড়া, তারা বহু আগেই ইসলামের পথ ছেড়ে গিয়েছে। আমরা যে ন্যায় চাই তাহলো প্রত্যেকের জন্য সম্মান, প্রত্যেকের জন্য স্বাধীনতা, মানবিক একটি সমাজ। নির্দোষদের হত্যা করে তা পাওয়া যায় না। নির্দোষ হত্যার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অন্ধকারে প্রবেশ করি। নির্দোষ মানুষের ভোগান্তি মানে আমাদেরও ভোগান্তি।

__জিয়াউদ্দিন সরদার__ একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। তার এই আর্টিকেলটি ইংল্যান্ডের দ্যা অবজার্ভার (১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১) সংখ্যা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

ঠিক ফ্লাইট ৭৭-এর উড্ডয়নের সময়ই নিউইয়র্ক থেকে ছাড়া ফ্লাইট ৯৩ তখনও আকাশে। সেই বিমানের যাত্রীদের হাতে তখনও আধ ঘণ্টা সময়। বেঁচে থাকার।

ফিল্ম কম্পোজার জিম ফার্মার প্রতিদিনের মতই তার সকাল বেলার নাস্তা করছিলেন তার এলাকার রাস্তার ক্যাফেতে। তখন সকাল প্রায় ৯টা। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোলাহলের মাঝে হঠাৎ ভয়ানক এক শব্দ। মনে হলো যেন প্লেনের শব্দ, কিন্তু ম্যানহাটনের প্রাণকেন্দ্রে এত নিচ দিয়ে প্লেন চলার কথা নয়। ফার্মার তার খবরের কাগজ ছেড়ে তাকালেন আকাশের দিকে।

শব্দটা হঠাৎ করে বেড়ে যায়। ফার্মারের মনে হল নীল একটা খণ্ড, তীরের মত বায়ুমন্ডলের ঘনত্ব ছেদ করে আঘাত হানলো আমেরিকার তথা বিশ্বের স্থাপত্য শিল্পের এক প্রতীক বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের দুটি টুইন টাওয়ারের একটিতে। ১১০ তলা ভবনের ৮১তম তলায় আট-নয় তলা সমান বিশাল ফুটো রেখে যায় প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভবনের ভেতরে ও বাইরে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে পুরো এলাকা।

আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১১ পৌঁছে গেল তার গন্তব্যে। আর বদলাতে শুরু করলো পৃথিবী।

কাছের এক ভবনে বসবাসকারী স্টুয়ার্ট ডেহান শব্দ শুনেই ছুটে গিয়েছিলেন তার বাড়ির ছাদে। দেখলেন আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে থেকে লাফ দিয়ে পড়ছে মানুষ। নব্বই-তলা থেকে পর্যন্ত ঝাঁপ দিয়েছে তারা। ডেহানের বর্ণনা— মানুষগুলো পড়ে যাচ্ছিলো না, বরং সিদ্ধান্ত নিয়েই ঝাঁপ দিচ্ছিল।

কি করুণ সেই সিদ্ধান্ত। আগুনে পুড়ে মরা আর ১,৩০০ ফুট উঁচু কংক্রিটের এক দানবের জানালা থেকে লাফ দিয়ে মরার ভেতর সিদ্ধান্ত। ডেহান দেখেছেন এক যুগলকে একে অপরের হাত ধরে লাফ দিতে। আরেক লোক শূন্যে ডিগবাজি খেয়েছেন অগণিত। তারপর রাস্তার পেভমেন্টে এসে ধাক্কা খেয়েছেন প্রায় দুশ' মাইল বেগে।

আঠারো মিনিট পরে ফ্লাইট ১৭৫ আঘাত হানে অপর টুইন টাওয়ারে। এবার সংঘর্ষ ঘটে আরো নিচে। উপর্যুপরি বিস্ফোরণ ছিল আরও ভয়ানক, এর শব্দ এবং ধোঁয়ার সঞ্চালন আরও ব্যাপক।

প্রথম অবস্থায় দুই সংঘর্ষের ধাক্কা সামাল দিতে পেরেছিল টুইন টাওয়ারের গড়ন কাঠামো। তবে দুই বিমানের ট্যাঙ্কি ভরা জ্বালানি পুড়তে থাকে ১,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। ভবন দুটির স্টিল সাপোর্ট সিস্টেম গলতে শুরু করলে হঠাৎ ধসে পড়ে ওপরের দিককার কয়েকটি তলা। সেই সঙ্গে চেইন রি-অ্যাকশনের মত একেক তলা করে পুরো ভবন দুটি ধসে পড়ে। একটার দশ মিনিট পর আরেকটা। ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে। প্রায় এক মাইলের এক-তৃতীয়াংশ দুটি স্থাপত্য

ভয়ঙ্কর ধ্বংযজ্ঞ দেখে কেঁদেছে আমেরিকা

বিস্ময় পরিণত হলো একশ' ফুট উচু ধ্বংসস্তূপে। বদলে গেল ইতিহাস। প্রেসিডেন্ট বুশ হুংকার দিলেন, 'নতুন করে লেখা হবে আমেরিকার ইতিহাস।' আমেরিকা, পশ্চিমা মিডিয়া টার্গেট করলো একজনকে। যিনি ইতিপূর্বেও বেশ কয়েকটি সফল সন্ত্রাসী আক্রমণ করেছেন আমেরিকার বিরুদ্ধে। পরাশক্তি আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করলো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকবাবেই প্রশ্ন আসে কে সেই ব্যক্তি? তার কতটা শক্তি যে সে বিদ্ধস্ত করে দিল আমেরিকার মতো সুপার পাওয়ারকে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য চোখ ফেরাতে হবে মধ্য এশিয়ার দিকে।

একজন লাদেন

পেশোয়ার। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার ধুলায়, সহিংসতায় আচ্ছন্ন এক শহর। সেখানে যে কোনো রাতে ছোট ছোট ঝুপড়ি হোস্টেলে বা বাড়িতে পাতলা, ছেঁড়া তোষকে বা খালি মাটির ওপর ঘুমিয়ে থাকে শত শত বালক/যুবকরা। ওরা উঠবে ভোরে। ফজরের নামাজ পড়বে মক্কা শরিফের দিকে। তারপর কাজে যাবে তাদের নেতার দিকে চেয়ে।

ওরা এসেছে পাকিস্তানের জনবহুল শহরতলির উপচেপড়া বস্তি থেকে, কায়রোর ধুলায় আবরিত হাট-বাজার থেকে, জর্ডান, গাজা, পশ্চিম তীরের অসংখ্য ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু ক্যাম্প থেকে। এদের মধ্যে কেউ এসেছে কোনো সচ্ছল পরিবার থেকে, বড় হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে উড়ে বেড়ানো তেল রপ্তানির ডলার খরচ করে। আবার কেউবা দিনমজুর, ঝাড়ুদারের ছেলে। কেউ হয়ত পশ্চিমা বিশ্বে সময় কাটিয়েছে, এমনকি জন্মেছে সেখানে।

তাদের উদ্দেশ্য তাদের পশ্চাৎপদের মতই বিচিত্র, বিস্তৃত। যুগের পর যুগ কিশোর, বালক, যুবকরা যেসব কারণে যুদ্ধে গেছে, সেসব কারণেই তারা এখানে। তারা আকৃষ্ট দুঃসাহসিকতার রোমাঞ্চে, পারস্পরিক সৌহার্দ্যে। তারা বিশ্বাস করে যে এখানে থাকা, থেকে যুদ্ধে যাওয়া হচ্ছে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য। মৃত্যু তাদের কাছে গর্বের বিষয়। এই দীক্ষায় দিক্ষিত করেছে তাদের নেতা। পেশোয়ার আগেও দেখেছে এদের। ১৯৭৯তে যখন সোভিয়েট ট্যাঙ্কবহরে ছেয়ে গিয়েছিল আফগানিস্তান, তখন সীমান্ত থেকে বিশ মাইল দূরে এই শহর ছিল মুজাহেদীন আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। তখন এই আফগানরাই ছিল পশ্চিমের মিত্র, তাদের হিরো। তারা সোভিয়েটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে পশ্চিমের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। শুধু অস্ত্রের খাতেই আফগানরা পশ্চিমা বিশ্বের তথা আমেরিকার কাছ থেকে পেয়েছিল দুই বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অনুদান। আজকে সেই আফগানরাই হচ্ছে পশ্চিমের শত্রু।

সোভিয়েট অনুপ্রবেশের ক'দিনের মধ্যেই শয়ে শয়ে মুসলিম পুরুষ এসে জড়ো হয়েছিল পেশোয়ারে। তারা যুদ্ধ করতে এসেছিল, যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। তাদের একজন ছিল ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এক সৌদি যুবক। গড়নে হালকা-পাতলা, উদ্দীপনায় ভরপুর। আজ তার পোস্টার শোভা পায় বিশ্বের আনাচে-কানাচে। তিনিই এই বালক যুবকদের নেতা। এই নেতার নাম ওসামা বিন লাদেন। এই সেই লাদেন যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকা।

সকালে তার অনুগত কয়েকশ' কিশোর-বালকের মত লাদেনও ফজরের নামাজ পড়বেন। তিনি কাতারে দাঁড়াবেন ডজনখানেক বডিগার্ড ও অতি কাছের কিছু লোক নিয়ে। তার বড় ছেলে মুহাম্মদও থাকবেন তার সঙ্গে। নামাজের পর চলবে কুরআন খতম, তারপর শুকনো আফগানি

মুহাম্মদ আতা ঃ একজন হাইজ্যাকার

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারে যে বিমানটি আঘাত করেছিল সম্ভবত আতা সে বিমানের পাইলট ছিলো।

জন্ম তারিখ– ০১.০৭.৬৮ সৌদি অথবা মিশরীয় বংশোদ্ভূত। তবে সে আরব আমিরাতের-এর পাসপোর্ট বহন করছিলো। হামবুর্গের হারবার্গ উপশহর ম্যারিয়েনস্ট্রাসে-এর একটি ফ্ল্যাটে ১৯৯২ সাল থেকে ৮ বছর বসবাস করছে। হামবার্গ টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জাহাজ নির্মাণ বিষয়ের ছাত্র ছিল। জার্মান বলতো চমৎকার। সেখানে সে মুসলমানদের নামাজ ঘর নির্মাণের জন্য আবেদন করেছিলো। শার্কিস বিলিয়ার্ড বারে তার আনাগোনা ছিল।

২০০০ সালের আগেই স্নাতক পাস করে এবং আটলান্টিক উপকূলে কিছুদিন ঘুরে বেড়ায়। স্থান পরিবর্তন করে জুন ২০০০-এ ভেনিস, ফ্লোরিডায় চলে যায়। সেখানে সে হালকা উড়োজাহাজ চালানোর ট্রেনিং স্কুলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কোর্স ফি দিয়েছেন ১০ হাজার ডলার। উৎসাহী হলেও স্কুলে অন্যান্যদের সাথে সম্পর্ক উষ্ণ ছিল না বলে জানান সেখানকার পরিচালক।

নবেম্বর ২০০০-এ সে FAA প্রশিক্ষণের প্রাথমিক বিষয়ে পাস করে এবং মায়ামিতে বড় জেট বিমানে সিম সেন্টারের মত বড় ভবন পাড়ি দেবার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলো। তিন ঘন্টায় ১৫০০ ডলারে 727 পরীক্ষায় ডিসেম্বর ২৯ এবং ৩০ তারিখে অংশগ্রহণ করে। পরিচালক জানান, তাকে ভালো বিমান চালানোর কৌশল প্রশিক্ষণ দেন।

২০০১-এর আগ পর্যন্ত আতার চলনবিধি রহস্যজনক। কিন্তু মাঝে মধ্যেই সে হামবুর্গে আসা-যাওয়া করতো। আমেরিকায় আসে ২ মে। বিমিনী মোটেল এপার্টমেন্টে অবস্থান করে। পরে হলিউড ড্রেসিডেনে বাসা বদল করে চলে যায়। পাম বিচে চারটি প্রশিক্ষণ বিমান নিয়ে যায় গত আগস্টে। স্বভাবে নম্র ও চোখা ধরনের। স্পোর্টস শার্ট, কাল জিন্স পড়তে পছন্দ করে। আগস্টে লং ড্রাইভে যেতে গাড়ি ভাড়া করেছিল কয়েকবার।

গত ২৮ আগস্ট আমেরিকার এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে ফ্লাইট-১১-এর টিকেট কেনে। এবং তার নিজ ভিসা কার্ড ব্যবহার করে তিন দিন আগ পর্যন্ত প্রায়ই তাকে যাতায়াত করতে দেখা যেতো। সে একই সময় আব্দুর রহমান আল ওমানীর নামেও একটি টিকেট কেনে। তারা এক সঙ্গে মায়ামি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে যায়।

জাকির হোসেন

রুটি ও কড়া চা দিয়ে নাস্তা।

এ সবই হবে রুটিনের মত। শুধু রুটিনমাফিক হয় না তার অবস্থান। তিনি কবে কোথায় থাকবেন, ঘুমোবেন, ঘুম থেকে উঠবেন তা কখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। হয়ত তিনি থাকবেন কান্দাহারের পুরনো সোভিয়েট এয়ারপোর্টে বানানো তার বিশাল বাড়িতে। হয়ত কাবুলের প্রাসাদতুল্য সেই বাড়িটিতে যেটা তিনি উপহার দিয়েছেন আফগান শাসক মোল্লা ওমরকে। তিনি থাকতে পারেন ওরুজগান পাহাড়ের গুহার ভেতর গড়া তার নতুন বেস-এ বা জালালাবাদের কাছে তার খামারে।

খুব সম্ভবত তিনি থাকবেন তার ডজনখানেক ট্রেনিং ক্যাম্পের একটিতে। এই ক্যাম্পগুলো চালায় লাদেনের নিজ হাতে তৈরি সংগঠন আল-কায়দা। ক্যাম্পগুলো বানিয়েছেন লাদেন নিজেই, তার পারিবারিক সম্পত্তি ও মুজাহেদীন আন্দোলনের সময় পাওয়া মার্কিন অনুদানের টাকা দিয়ে। যেই মার্কিন অর্থ মদদের কারণেই আজ তার সম্পত্তির পরিমাণ ৩০ কোটি ডলারের ওপরে।

উল্লেখ করা জায়গাগুলোর বেশির ভাগই আন্ডারগ্রাউন্ড। এগুলোর খোঁজ রাখা দুঃসাধ্য। এমনকি স্যাটেলাইটের জন্যও। সে কারণে কারোর কোনো ধারণা নেই লাদেন গতকাল কোথায় ছিল, আজ কোথায় আছেন বা আগামীকাল কোথায় থাকবেন। তিনি নিজে এবং খুব কাছের ক'জন ছাড়া কেউই জানে না– সিআইএ না, পেন্টাগন না, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর না, ব্রিটিশ এমআইসিক্স না।

৪৪ বছর বয়স্ক লাদেনের কাছে 'ওয়ার্ল্ড'স মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান' হওয়া নতুন কিছু নয়। ১৯৯৮ সালে কেনিয়া ও তানজানিয়ার মার্কিন দূতাবাসের বোমা বিস্ফোরণের পাল্টা জবাব দিতে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ৭৫টি টোমাহক মিসাইল মেরে চেষ্টা করেছিলেন লাদেনের আফগানি সংগঠন নিশ্চিহ্ন করে দিতে। মার্কিন সেই হামলা চিড়ও ধরাতে পারেনি লাদেনের চারদিকে গড়া শক্ত দেয়ালে। উল্টো লাদেনকে পরিচিত করেছে বিশ্বের কাছে। আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের ওপরে দেয়া পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা আরও দৃঢ় করেছে তাদের লাদেনের নিরাপত্তা রক্ষা করতে।

গত দুই বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নেয়া সর্বকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল গোয়েন্দা অপারেশন চালিয়েছে লাদেনকে কেন্দ্র করে। গোটা বিশেক স্যাটেলাইট সার্বক্ষণিক নজর রাখে আফগানিস্তানের প্রতিটি বালুর কণায়। অত্যাধুনিক অডিও টেকনোলজি দিয়ে শুনতে চেষ্টা করা হয় প্রতিটি কথা, প্রতিটি উচ্চারণ। সুপার কম্পিউটার দিয়ে ট্র্যাক করা হয় লাদেনের ও তার আশপাশের সবার প্রতিটি ব্যাংক লেনদেন।

তবুও তাদের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে লাদেন।

আমেরিকার আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে নতুন শতকের এই সময় পর্যন্ত দুনিয়া জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছে এবং মিত্রদের মদদ জুগিয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করলে আমেরিকাকে বিশ্বের সবচে' বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলতে হয়। অর্থ ও শক্তির ক্ষমতার দাপটে আমেরিকা আজও সারা দুনিয়ায় কায়েম করে রেখেছে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। ছোটখাট দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক সংঘাতকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে রূপ দেওয়া এবং তাতে জড়িয়ে ফায়দা নেওয়ার প্রবণতা আমেরিকা গত কয়েক দশক ধরে চালিয়ে এসেছে। আমেরিকার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কয়েকটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা হলো।

১৯৪৫ : ২য় মহাযুদ্ধের শেষভাগে আগস্ট মাসে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে দুটো পারমাণবিক বোমা ফেলে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যা করে সভ্যতার ইতিহাসে সবচে' বড় সন্ত্রাসী ও বর্বোরোচিত ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। আজ পর্যন্ত জাপানের কাছে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়া তো দূরের কথা, দুঃখ প্রকাশ পর্যন্ত করেনি আমেরিকা।

১৯৫০-৫২ : কোরিয়ার যুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়াকে অস্ত্রসহ সমর্থন জোগায় আমেরিকা। এই কোরিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমেই আমেরিকা বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধে সরাসরি কোনো একপক্ষের হয়ে সরাসরি জড়িয়ে পড়ার ধারা সূচনা করে যা পরবর্তী দশকগুলোতে অব্যাহত থাকে।

১৯৬০ : কথিত বিপজ্জনক ব্যক্তি লুকিয়ে আছে, তাকে ধরতে হবে– এই অজুহাতে ডোমেনিক রিপাবলিকে মার্কিন সৈন্য সরাসরি হানা দেয়।

১৯৬২ : কিউবায় রাশিয়া মিসাইল বেস স্থাপনের উদ্যোগ নিলে রণদামামা বাজিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে নেমে যায় যুক্তরাষ্ট্র। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনই বেধে যেতো যদি না ক্রুশ্চেভ বিচক্ষণতার পরিচয় পেতেন। এরপর থেকে সিআইএ বহুবার ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে হত্যার চেষ্টা করেছে।

১৯৬৫ : কম্বোডিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমা হামলা চালায়।

১৯৭০ : ভিয়েতনাম যুদ্ধের এই পর্যায়ে নমপেনে বোমা ফেলে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে মার্কিন সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণ করে।

১৯৭৯ : আফগান যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে আমেরিকা। রাশিয়াকে আফগানিস্তান থেকে হটানোর জন্য অস্ত্র তুলে দেয় আফগানদের হাতে। ১৯৮৯ সালে রাশিয়া পরাজয় স্বীকার করে আফগানিস্তান থেকে পশ্চাদপসারণ করে।

১৯৮১ : মধ্যপ্রাচ্যে ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরাককে সরাসরি সমর্থন জোগায় আমেরিকা। যোগান দেয় অস্ত্র। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবে মার্কিন অনুগত শাহ রাজবংশের পতন ঘটে এবং ইমাম খোমেনী শাসনভার গ্রহণ করেন। এরপর থেকে আমেরিকা সবসময়ই ইরানকে শায়েস্তা করার চেষ্টায় থাকে। ১৯৮১ সালে যাত্রীবাহী ইরানী বিমানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৮৮ : লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীর বাসভবনে হামলা চালালে গাদ্দাফীর পালক কন্যা নিহত হয়।

১৯৮৯ : পানামায় মার্কিন সেনাবাহিনী হানা দেয় এবং মাদক চোরাচালানে জড়িত এই অজুহাতে নরিয়েগাকে অপহরণ করে নিয়ে আসে।

১৯৯১ : কুয়েতকে দখলমুক্ত করে ইরাককে শায়েস্তা করার জন্য জাতিসংঘের তথাকথিত অনুমোদন নিয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধে বহুজাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় আমেরিকা। যুদ্ধে পরাজিত হয় ইরাক। আত্মসমর্পণ করা বহু ইরাকি সৈন্যকে ট্যাংকের নিচে নির্মমভাবে পিষ্ট করা হয় আমেরিকার নির্দেশে।

'৫০, '৬০ ও '৭০-এর দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন সদ্য স্বাধীন দেশগুলোয় বিভিন্নভাবে হানা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন মদদে এসব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক ও তার সরকারকে উৎখাত করা হয়। ১৯৭৩ সালে চিলিতে আলেন্দকে হত্যা, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে হত্যাসহ আরো অনেক হত্যাকান্ডের নেপথ্যে মার্কিন মদদ ছিল স্পষ্ট। আরব বিশ্বে সিরিয়া ও লিবিয়া রুশ মিত্র হওয়ার কারণে এ দেশগুলোর ওপর বিভিন্নভাবে নেমে আসে মার্কিন আক্রোশ। প্যালেস্টাইনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করার জন্য ইসরাইলকে সবরকম মদদ দিয়ে আসছে আমেরিকা। ইসরাইল ১৯৮১ সালে ইরাকের ওসিরাক পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস করে দেয় বিমান হামলা চালিয়ে। ১৯৮৩ সালে তিউনিসিয়ায় পিএলও সদর দপ্তরেও বিমান হামলা চালায় ইসরাইল। মধ্যপ্রাচ্য সংকট জিইয়ে রাখা এবং ইসরাইলকে ক্রমাগত শক্তিশালী করার পেছনে রয়েছে মার্কিন মদদ। বসনিয়া-হারজেগোভিনায় হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানকে যখন হত্যা করা হয়েছে তখন মার্কিন বিমান মানবতার পক্ষ নিয়ে সার্বিয়দের ঠেকাতে যায়নি। অথচ উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকেই তুচ্ছ অজুহাতে ইরাকের ওপর বিমান হামলা আজও অব্যাহত রেখেছে আমেরিকা।

আসজাদুল কিবরিয়া

ওসামা বিন মুহাম্মদ লাদেনের জন্ম সৌদি আরবের ধনাঢ্য এক পরিবারে। সৌদি রাজপরিবারের সঙ্গে সখ্যতার মাধ্যমে তার বাবা গড়ে তোলেন বিশাল কন্সট্রাকশান ও ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা। ৫০ ভাইবোনের মধ্যে ১৭ তম লাদেন। '৭০-এর দশকে যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন,

তখন সৌদি শিক্ষাক্রমে মিশরের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার দ্বারা নির্বাসিত চমরপন্থি মুসলিম চিন্তাধারার পুনঃজাগরণ ঘটছে। সেই সময়েই লাদেন চরমপন্থি ইসলামিক মতবাদকে কাছে টেনে নেন।

লাদেন সৌদি আরবের বাদশা আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটিতে 'ম্যানেজমেন্ট ইকনমিক্স ও থিওলজি'তে পড়াশোনা করেছেন। পাস করেছেন কিনা সেটা জানা যায় না। যদিও লাদেন সম্পর্কে প্রচলিত আছে তিনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। এটা একটি ভুল তথ্য।

১৯৭৯ সালের নবেম্বরে কয়েকশ' মাদ্রাসা ছাত্র পবিত্র মক্কা শরীফের দখল নিয়ে নেয়। সৌদি সরকার সে সময় লাদেনকে চিহ্নিত করে সেই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে। লাদেনের পরিবার তাকে পাঠিয়ে দেয় অন্যত্র—আফগানিস্তানের সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধক্ষেত্রে। সেখান থেকে লাদেনকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

লাদেন প্রথমে ট্রেনিং নেন মুজাহেদিনদের কাছে। তার মেধা ও চতুরতার পুরস্কার হিসেবে তাকে স্টেশন করা হয় গুরুত্বপূর্ণ এক অবস্থান পেশোয়ারে। সেখানে লাদেনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে আফগানিস্তানের গেরিলাদের কাছে টাকা, অস্ত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জাম পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বাধীন এক ইউনিট। এই সার্ভিস ইউনিট হয়ে ওঠে মুজাহেদিনদের মূল লিয়াজোঁ পয়েন্ট। কিছু দিনের মধ্যে এখান থেকেই চালানো হয় যুদ্ধ। এবং লাদেন ছিলেন তার নেতৃস্থানীয় অবস্থানে।

তার অবস্থানের দাপট খাটিয়ে এবং তার হাত দিয়ে বন্টন করা মার্কিন অর্থের ব্যবহারে লাদেন তৈরি করে ফেলেন তার নিজস্ব মিলিশিয়া গ্রুপ আল-কায়দা। যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন '৮০'র দশক শেষে আফগানিস্তান ছেড়ে যায়, তখন এই আল-কায়দা গ্রুপ হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন। তবুও লাদেন টিকিয়ে রাখেন একে, রিক্রুট করতে থাকেন নতুন বালক-কিশোরদের। লাদেন আবার ফিরে গেলেন সৌদি আরবে। কিন্তু তার সংগঠন 'আল কায়দা' কেও সক্রিয় রাখেন।

১৯৯০ সালে উপসাগরীর যুদ্ধের সময় তার পৈত্রিক আবাসভূমি সৌদি আরবে মার্কিন সামরিক অবস্থানের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন লাদেন। সেই প্রতিবাদের জের হিসেবে সৌদি জেলেও সময় কাটাতে হয় তার। জেল থেকে বেরিয়ে লাদেন পালিয়ে যান প্রথমে সুদানে। তারপর আফগানিস্তানে।

সেই থেকে শুরু লাদেনের বর্তমান যুদ্ধের এবং আল-কায়দার নতুন উদ্দেশ্যের। লাদেন

বুশের যুদ্ধ ঘোষণা

স্বাক্ষরিত এক ফতোয়ায় বলা হয়েছে—প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে যত সম্ভব সামরিক এবং বেসামরিক মার্কিনী এবং তাদের মিত্রদের মেরে ফেলা। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনীদের অবস্থানকে লাদেন দেখেছেন তার পবিত্র মাটির অপবিত্রকরণের সদিচ্ছা হিসেবে। এবং প্রতিটি মুসলিমকে তিনি আহ্বান করেছেন সহিংসতার মাধ্যমে একে প্রতিহত করতে।

তবে লাদেনের আক্রোশ শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি আফগানিস্তানের তালেবান সরকার বাদে পৃথিবীর বাকি সব ইসলামী রাষ্ট্রকে দেখেন ঘৃণার চোখে। তার মতে মার্কিন ও পশ্চিমা অর্থ ও সংস্কৃতি দ্বারা অপবিত্র হয়েছে এ সকল জাতি।

তার এই মানসিকতার জন্যই প্রথমাবস্থায় কোনো প্রমাণ ছাড়াই তাকে দোষারোপ করা হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বরের ধ্বংসযজ্ঞের জন্য। আর আতাসহ অন্য হাইজ্যাকারদের বলা হচ্ছে আল-কায়দার সদস্য। কারণ এই ধ্বংশজজ্ঞের ফলাফল শুধু আমেরিকার বিধ্বস্ত রূপ হতে পারে না। এই আঘাত হানা হয়েছে মুসলিম বিশ্ব ও বাকি বিশ্বকে সম্পূর্ণ দুই ভাগে বিভক্ত করতে। তবেই হয়ত লাদেন পারবে মধ্যযুগীয় ক্রুসেডের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে পশ্চিমা বিশ্বকে অবমাননা করতে।

আমেরিকারই তৈরি লাদেন এখন যুদ্ধ করছে আমেরিকারই বিরুদ্ধে। তার নিজের তৈরি দানবের ভয়ে সন্ত্রস্ত আমেরিকা।

নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলায় শঙ্কিত শুধু আমেরিকা বা পশ্চিমা বিশ্ব নয়, শঙ্কিত নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্থাপনের চেষ্টায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া প্রতিটি মুসলিম জনপদ। এদের মধ্যে সেদিনের হামলা সবচেয়ে ক্ষতি করেছে ফিলিস্তিনি স্বায়ত্বশাসন আন্দো-লনের।

ইসলায়েলের মা'আরিভ পত্রিকায় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির প্রফেসর ইহুদ স্পুনজাক বলেছেন, 'ইহুদিদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই হামলা ছিল সর্বকালের সেরা ও গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক রিলেশন অ্যাক্ট। নিউইয়র্কের অবস্থা ছিল করুণ, তবে সেই ভয়াবহ ছবিগুলো পশ্চিমা বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছে যা হাজারো কূটনীতিক বোঝাতে পারতো না।

ইসরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এই হামলাকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছে ইসলামের প্রতিচ্ছবি হিসেবে। এবং তার মাধ্যমে ন্যায্যতা প্রমাণ করতে চাইছে ফিলিস্তিনিদের ওপর তাদের নিজেদের বৈষম্যমূলক, আক্র-মণাত্মক ব্যবহারকে।'

অথচ ফিলিস্তিনিদের আন্দোলন শুধু তাত্ত্বিক বা আক্রোশজনিত নয়। তাদের সংগ্রাম জীবনের, জীবিকার, অধিকার প্রতিষ্ঠার, সামান্য মর্যাদা স্থাপনের। ১১ সেপ্টেম্বরের মত অমানবিক, পৈশাচিক হামলা তাদের সেই ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের পরিপন্থি।

ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ

আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় সংঘটিত হবে সেই যুদ্ধ? কাকেই বা আমেরিকা চিহ্নিত করবে লাদেনের মিত্র বা শত্রু হিসেবে। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ঘোষণা করেছেন যে, এই যুদ্ধে কোনো 'মিডল গ্রাউন্ড' নেই। সবাই হয় তাদের পক্ষে নতুবা বিপক্ষে।

আমেরিকা যদি টার্গেট করে আফগানিস্তানকে তবে সেই যুদ্ধ কি হবে তালেবান বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে? না কি অপারেশনে চলবে লাদেনের খোঁজে? আফগানিস্তান পৃথিবীর সবচাইতে দুর্গম দেশগুলোর একটি। তার ওপরে রাশিয়া এবং চীন বাদে পার্শ্ববর্তী সব দেশই ইসলামিক রাষ্ট্র। সব মিলিয়ে আফগানিস্তানে হামলা চালানো হবে দুরূহ।

যদি আমেরিকা জঙ্গি বিমান বা ক্রুজ মিসাইলের মাধ্যমে আকাশপথ দিয়ে

লাদেনের অবস্থানগুলোর আক্রমণে যায় সেক্ষেত্রেও সফলতার নিশ্চয়তা নেই। ১৯৯৮তেও সেরকম হামলা করে সুবিধা করতে পারেনি তারা। অপরদিকে যে কোনো সীমান্ত গিয়ে 'গ্রাউন্ড অ্যাটাক' করলে তা হবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে, শুধুমাত্র লাদেনের বিরুদ্ধে নয়। তখন আমেরিকা হারাতে পারে তাদের ইসলামিক মিত্র দেশগুলোর সহায়তা ও সমর্থন এবং নিশ্চিতভাবে হারাবে পুরো মুসলিম বিশ্বের জনগণের এবং জনমতের আস্থা।

সেরকম একটা পরিস্থিতি জয়ী করবে লাদেনকেই। কারণ লাদেনের মূল উদ্দেশ্য পৃথিবীতে ইসলামের পক্ষ এবং বিপক্ষের বিভাজন।

সত্যিকার অর্থে আমেরিকা লড়াই করবে ছায়ার বিরুদ্ধে। তারা সেই লড়াইকে অভিহিত করতে চাচ্ছে যুদ্ধ হিসেবে। কিন্তু বর্তমান সময়ের যুদ্ধের ব্যাখ্যায় দু'পক্ষে শামিল হতে হয় অন্তত দুটি রাষ্ট্রকে। কিন্তু আমেরিকার এই নতুন যুদ্ধে তাদের প্রতিপক্ষ কোনো রাষ্ট্র নয় বরং একজন ব্যক্তি বা একটি মতবাদ– সন্ত্রাস।

সেখানেও ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধে আমেরিকা। বরং বলা চলে নিজেদের সঙ্গেই যুদ্ধ তাদের। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র তো তারাই।

সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের প্রচলিত সংজ্ঞা নিছক একতরফা প্রপাগান্ডার মত। আজ আমরা সেই দেশকেই সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলছি, সেই ব্যক্তিকেই সন্ত্রাসী বলছি যাকে আমেরিকা বা পশ্চিমা মিডিয়া চিহ্নিত করছে। পশ্চিমা চিন্তাধারা, মতবাদ, শোষণমূলক কর্মকাণ্ডের যারাই প্রতিবাদ করছে, তারাই এখন আমাদের চোখে সন্ত্রাসী।

আজ ফিলিস্তিনিদের আত্মরক্ষার স্বার্থে অস্ত্র তুলে নেয়াকে পশ্চিমা মিডিয়া আখ্যায়িত করছে সন্ত্রাস হিসেবে। অথচ তারা বলছে না ফিলিস্তিনি জনপদের সংগ্রামের কথা, তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, অবিচারের কথা। আজ কলম্বিয়ায় ড্রাগ ব্যারনদের বিরুদ্ধে সোচ্চার জনগণকে তারা বলছে সন্ত্রাসী। অথচ তারা দেখছে না আমেরিকারই পোষ্য ধনকুবেররা কিভাবে শুষে নিয়ে যাচ্ছে সে দেশের সম্পদ, ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের জাতিকে। আজ সাদ্দাম হোসেনের নিছক বেঁচে থাকা বা নির্বুদ্ধিতাকে তারা বলছে সন্ত্রাস। কিন্তু অভুক্ত, অসুস্থ ইরাকি শিশুদের মৃত্যুকে তারা তুলে ধরছে না আমাদের সামনে।

পশ্চিমা মিডিয়া ও তার চালিকাশক্তি পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর প্রচারণা ও ব্রেইনওয়াশে আমরা আজ এতটাই অন্ধ যে আমরা এক যুগেরও বেশি সময় যাবৎ ইরাকের জনগণের বিরুদ্ধে অমানবিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাকে সন্ত্রাস মনে করি না। আমরা পানামার অবাধ্য নেতাকে অপসারণের নামে সে দেশ দখলকে সন্ত্রাস বলি না। আমরা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের স্ক্যান্ডাল এড়াতে যখন-তখন নিরীহ জনপদকে বম্বিং করাকে সন্ত্রাস বলি না। আমরা ইসরায়েলের অনৈতিক জমি দখল ও অবাধ অত্যাচার এবং তার মার্কিন মদদকে সন্ত্রাস বলি না। পশ্চিমা মিডিয়া সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করছে লাদেনকে। লাদেনের যে কর্মকান্ড তাতে অবশ্যই প্রমাণ হয় লাদেন সন্ত্রাসী। কিন্তু লাদেনকে যারা

ফ্লাইট নাম্বার ৯৩ ...

পেনসিলভেনিয়ার একটি গ্রামে লেকের পাশে একজন শ্রমিক কাজ করছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করেন পানির ওপর সাদা রঙের কি যেন পড়ল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল স্ফুলিঙ্গের মতো আকাশে কি যেন উড়ছে। সন্দেহ হচ্ছিল যে কিছু একটা হয়েছে। আকাশে ধোঁয়া এবং কী যেন উড়ছিল।

বোয়িং ৭৫৭ ২০০ তখন ১০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জ্বলছিল। আমেরিকার উড়োজাহাজ ৯৩ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্ত থেকে ৮টা ১ মিনিটে ছাড়ে। ভূমি থেকে ৪৫০ কিলোমিটার বেগে তা চলছিল। এতে ৩৮ জন যাত্রী এবং ২ জন পাইলট ও ৫ জন ক্রু ছিল। কেউই বাঁচতে পারেনি। এটিও ছিনতাই হয়েছিল। কিন্তু টার্গেট ম্যানহাটন কিংবা ওয়াশিংটন ছিল না। লক্ষ ছিল ক্যাম্প ডেভিড, যেখানে দুটি মধ্যপ্রাচ্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এটা এখনও নিশ্চিত নয়, ছিনতাইকারীরা কখন আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিল। তবে এটা সকাল ৯টার আগেই হবে। মধ্যপ্রাচ্যীয় ধাঁচের তিনজন লোক মাথায় লাল ফ্যাটা বেঁধে তাদের সিট থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং ছুরি দেখিয়ে শক্তি প্রদর্শন করে। তারা দাবি করে রেড বক্সে বোমা আছে। এভাবে তারা বিমান নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। পাইলট যখন ঘোষণা করলেন, বিমানে বোমা আছে, একজন যাত্রী তখন বুঝতে পারছিলেন কোনো কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তিনি যাত্রীদের যে যার সিটে বসে থাকতে বলেন। কিছুক্ষণ অবস্থান করে তিনি জানান, আমরা তাদের ডিমান্ড নিয়ে আলোচনা করছি। তিনি বলেন, আমরা বিমানবন্দরে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু শুরু থেকেই তাদের মেরে ফেলার পরিষ্কার মানসিকতা ছিল। তারা অন্তত একজন পুরুষ যাত্রীকে ছুরিকাহত করে এবং পাইলটসহ ক্রু ও যাত্রীদের বিমানের পেছনে জড় করে।

ফ্লাইট-৯৩'র যাত্রীরাই জানতে পারে ম্যানহাটনে এবং ওয়াশিংটনে কি হয়েছে। উড়ন্ত অবস্থায় কয়েকজন যাত্রী তাদের পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। ৯টা ৫৮ মিনিটে অন্তত দু'ঘন্টা বিমানে থেকে পেনসিলভানিয়াতে এক যাত্রীর ফোন রিসিভ করা হয়েছিল। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লাইট ৯৩-এর বাথরুমে তিনি নিজেকে আটকে রেখেছেন। বলেন, বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন এবং বিমানের কেবিনে সাদা ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। থমাস বারনেট তার স্ত্রীকে বলেন, আমি এখন বিমানে, তারা ছুরি দেখিয়ে উপহাস করছে। তারা বলছে তাদের কাছে বোমা আছে। কর্তৃপক্ষকে জানাও। এ সময় ছিনতাইকৃত বিমানটি ওহাইওর ক্লিভল্যান্ডের ওপরে ঘোরানো হয় ওয়াশিংটনের দিকে। এটা তখন নিশ্চিত হয়ে গেল পরিকল্পনাটি কি ছিল। রাজধানীতে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্থ ছিনতাইকৃত বিমানটি এখনও আকাশে আছে এবং সেখান থেকে সংকেত দিচ্ছে। এতে ওয়াশিংটনের রাস্তাঘাট এমনকি সরকারি কর্মীরাও তাদের ডেস্ক ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

জেরিমি গ্লিক সেলস ম্যানেজার। সপ্তাহ খানেক আগে তার ৩১তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছেন। তিনি স্ত্রী এলিজবেথের সঙ্গে ৩০ মিনিট যাবৎ কথা বলছেন। কিন্তু ২০ মিনিটের মাথায় এফবিআই এজেন্টদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে দেন। গ্লিক তার স্ত্রীকে বলছিলেন, সে এবং কয়েকজন যাত্রী ঠিক করেছিল তাদের একটা গ্রুপ তাদের সঙ্গে অভিনয় করবে। কিন্তু তার পর কি হয়েছিল তা এখনও অজানা।

বারনেট তার স্ত্রীকে বলছিলেন, 'আমি জানি আমরা সবাই মরতে যাচ্ছি।' তিনজন ব্যক্তি আমাদের মেরে ফেলতে কিছু একটা করছে। সে স্ত্রীকে সুন্দর জীবন কাটানোর প্রত্যাশা করে এবং তাদের তিন বছরের শিশু কন্যাকে দেখাশোনা করতে বলে। তার পর গোলযোগ এবং হট্টগোলে তার কথা আর কিছু শোনা গেল না।

বিমান পথে কি হয়েছে এগুলো তার পরিষ্কার ক্লু। আকস্মিকভাবে দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে তা কয়েকবার দ্রুত এদিক ওদিক ঘুরে যায়। ইঞ্জিনের শব্দও বিকট ছিল। তখন কোনো একজন খুব সম্ভব ছিনতাইকারীরাই যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দেয়। পেনসিলভেনিয়ার পাহাড়ের ওপর বিমান ঘুরছিল, তখন তা আবার ঘুরিয়ে ফেলা হয়। এরপর বিমানটি ভূপতিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, বিমানটি এমনই নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় ছিল যে তা ওপরে-নিচে ওঠানামা করে উড়ছিল। একটি গ্রামের মধ্যে একটি পুরনো খনির ওপর বিমানটি ক্র্যাশ করে ১০টা ৬ মিনিটে। পাঁচ মাইল পর্যন্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিল। কাউকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

জাকির হোসেন

হাসিনা-খালেদা দু'নেত্রীই রাজি

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা চালানোর কাজে সহায়তাতমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ও বিমান ঘাঁটি ব্যবহারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অনুরোধ জানিয়েছে সে বিষয়ে সরকার এখন (সোমবার রাত) পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। বিষয়টি বাংলাদেশের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক হলেও এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার পররাষ্ট্র বিষয়ক বিশেষ সহকারী সি এম শফি সামি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মহল, বুদ্ধিজীবী এবং কূটনৈতিক মহলের সাথে আলোচনা শুরু করেছেন।

প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দেওয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এর মাধ্যমে দু'দলই আমেরিকার কাছে প্রিয়ভাজন থাকার চেষ্টা করছে।

ধারণা করা হচ্ছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জটিলতাকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্তত নির্বাচন পর্যন্ত এ ধরনের কোনো কিছু বাংলাদেশের পক্ষে করা কঠিন হবে বলে আমেরিকাকে জানাতে পারে এবং এ ধরনের অনুরোধ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানাতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত মার্কিনিদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হবে না বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

একাধিক বিশ্লেষক মনে করছেন, আমেরিকা বাংলাদেশকে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবেই দেখে আসছে। মূলত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের বিমান ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের জন্য আমেরিকা আগ্রহী। তাছাড়া কোনো কোনো মহলের বাংলাদেশে তালেবান ও মুসলিম উগ্রপন্থী গোষ্ঠীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এ ধরনের অপপ্রচারেও বহির্বিশ্বে বিশেষত আমেরিকায় বাংলাদেশ সম্পর্কে এক ধরনের সন্দেহজনক মনোভাব তৈরি হওয়া আমেরিকার এ ধরনের অভিপ্রায়ের পেছনে কাজ করছে। বিশেষ করে ভারত যখন আমেরিকাকে সবরকম সামরিক সহযোগিতা দিতে রাজি তখন নিকটবর্তী ভারতকে এড়িয়ে হাজার মাইল দূরে কেন বাংলাদেশকে বেছে নেওয়া হচ্ছে সেটাও প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

আসজাদুল কিবরিয়া

লাদেন বাহিনীর 'আল কায়দা'র কিশোর তরুণদের প্রশিক্ষণ

তৈরি করে, যারা লাদেনের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে সেই আমেরিকার কথা কোনো মিডিয়া বলছে না। লাদেন হঠাৎ করে লাদেন হয়নি, আমেরিকা তাকে তৈরি করেছে। একজন নয় আমেরিকা তৈরি করেছে এমন হাজারো লাদেন। একথাও সত্যি যে সাদ্দাম হোসেনও আমেরিকারই তৈরি।

আমেরিকা যদি যুদ্ধের সংজ্ঞা বদলে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, তবে তাকে বদলাতে হবে তার জনমনে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা। রাষ্ট্র-সন্ত্রাসের একতরফা ব্যাখ্যাদান দিয়ে তার লোপ ঘটানো সম্ভব নয়।

১১ সেপ্টেম্বর ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলা ছিল পৈশাচিক, নির্মম। এর নিন্দা করি আমরা সবাই এবং বিশ্বাস করি এই হামলার জন্য যতটা দায়ী সন্ত্রাসীরা সেটা লাদেন বা যেই হোক না কেন, ঠিক ততটা বা তার চেয়ে বেশি আমেরিকা নিজে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে মাড়িয়ে মানুষ মানবিকতা বা নৈতিকতার কথা ভাবতে পারে না। যে বাবা তার চোখের সামনে দেখছে ছেলের মৃত্যু, বোন দেখছে ভাইয়ের মৃত্যু, সন্তান দেখছে বাবার মৃত্যু তাদের জীবনে মানবিকতা বলে কিছু থাকতে পারে না। হত্যা করা হচ্ছে, গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ি। যুগের পর যুগ ধরে ইসরায়েল ফিলিস্তিনীদের ওপর চালাচ্ছে এই নির্যাতন। ইসরায়েলকে পুরো শক্তি দিয়ে সাপোর্ট করছে আমেরিকা। শুধু প্যালেস্টাইন নয়, প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশকেই এভাবে দমিয়ে রাখছে আমেরিকা। মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার এই অনৈতিক, অমানবিক অবস্থানের কারণে তারা হয়ে উঠছে প্রতিশোধ পরায়ণ। যার সুযোগ নিচ্ছে লাদেনরা। তাদের রিক্রুট করছে 'আল-কায়দা' দলে।

আমেরিকা এবার তথাকথিত লাদেন বিরোধী যুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকেই ব্যবহার করতে চাইছে। এতদিন এক আরব রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতো আরেক আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এখন তার চোখ পড়েছে উপমহাদেশের দিকেও। এখন তারা পাকিস্তানকে ব্যবহার করছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। ব্যবহার করতে চাইছে বাংলাদেশকেও। কিন্তু ভারতকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমেরিকা অতটা উৎসাহী নয়। সেটার একটা কারণ হয়ত ভারত মুসলিম রাষ্ট্র নয় বলেই।

আমরা অবশ্যই মনে করি সেদিনের হামলা শুধু আমেরিকার বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল মানবতা, মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে। ছিল আইন এবং নৈতিকতা পরিপন্থী। আমেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্ব যদি সত্যিই রোধ করতে চায় এই বর্বর পরিপন্থিতা, তবে তাদেরও থাকতে হবে সেই একই নিয়মের মধ্যেই, একই নৈতিকতার মধ্যেই।